একা মোর গানের তরী : অতুলপ্রসাদ সেন

সুকন্যা রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের জন্মের (১৮৬১) এক দশক পরে অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম (১৮৭১) এই এক দশকে জন্মেছিলেন আরো দুজন বিখ্যাত গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩) এবং রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫)। রবীন্দ্রবৃত্তের এই কবি চতুষ্টয়ই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দশক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের গানে সুর ও বাণীর ভুবনকে শাসন করেছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, নিজস্ব কণ্ঠস্বরে পরিচিত তবে একটি সাধারণ ধর্মও এদের মধ্যে বর্তমান ছিল তা হল এঁরা শুধু গীতিকার নন, সুরকারও ছিলেন। অর্থাৎ নিজের বাণীতে সুর বসিয়ে এঁরা নিজেরাই শ্রোতা বা পাঠকের কাছে তাদের বাণীকে পৌঁছে দিতেন। বলা যায় নজরুল ইসলাম পর্যন্ত বাংলা গানের এটিই ছিল সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কাজেই রবীন্দ্র-বৃত্তে দাঁড়িয়ে সংগীত রচনা করায় অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথের বাণী কখনো কখনো এই সময়ের গীতিকারদের ছুঁয়ে গেলেও, তাঁরা তাঁদের সুর ও গায়কীর বৈচিত্র্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যও প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। সুর ও বাণীর এই বৈচিত্র্যের কারণেই দ্বিজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্তের মতো নাম আজও সংগীত পিপাসু বাঙালি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করেন।

ডাক্তার রামপ্রসাদ সেন ও হেমন্তশশীর প্রথম সন্তান অতুলপ্রসাদ ১৮৭১-র ২০ অক্টোবর ঢাকায় মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের ভাটপাড়ার বাড়ীতে জন্মেছিলেন। রামপ্রসাদ ছিলেন কবি গায়ক ও ভক্ত। উষা বন্দনার মধ্য দিয়ে তাঁর দিন শুরু হত। সেই বন্দনাগীত অতি শৈশবেই অতুলপ্রসাদের মনকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। বলা যায় অতুলপ্রসাদের মনোবীণার তার সেই শিশুকালেই নিজের অজান্তেই বেঁধে দিয়েছিলেন বাবা রামপ্রসাদ। কৈশোরের দিনগুলিতে গানের জগতে পৌঁছে দিয়েছিলেন মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত। তিনি গান রচনা করতেন, তাতে সুরও দিতেন তিনি। গলায় মৃদঙ্গ ঝুলিয়ে কীর্তন করতেন পথে নেমে।

কীর্তনের আসরে শিশু অতুলপ্রসাদ তাঁর সঙ্গী হতেন। সকলের সঙ্গে অতুলপ্রসাদও দোহার দিতেন। আর এই দোহার দিতে দিতে শৈশবের দিনগুলিতেই অতুলপ্রসাদ হয়ে উঠেছিলেন মূল গায়েন। তখন দোহার দিতেন মাতামহ কালীনারায়ণ এবং তাঁর সাথীরা। কালীনারায়ণ ব্রাহ্ম হওয়ার তাঁর কীর্তনের আসরে সব ধর্মের মানুষ একসাথে মাতোয়ারা হয়ে কীর্তন করতেন। শুধু তাই নয় কালীনারায়ণ অত্যন্ত উদার মনের মানুষ ছিলেন। মানুষের সেবা করে, খাইয়ে, দান করে তৃপ্তি পেতেন। আবার মূর্তি নির্মাণ বা চিত্রাঙ্কনের অসাধারণ ক্ষমতাও ছিল তাঁর। বালক অতুলপ্রসাদ মাতামহকে অত্যন্ত গভীরভাবে অনুসরণ করেছিলেন। ফলে মাতামহের সান্নিধ্যেই সংগীতের জগতে যেমন তাঁর হাতেখড়ি হয়ে গিয়েছিল তেমনি শৈশবের সেই দিনগুলিতেই পরিণত অতুলপ্রসাদের মানসপটটিও এঁকে দিয়েছিলেন মাতামহ কালীনারায়ণ। তাছাড়া ঢাকা শহরটি ছিল সংগীতচর্চার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। মামাবাড়ির আবহাওয়াতেও ছিল সংগীত। পনিমামা ও বিনয় মামা গান বাজনা করতেন, ছবি আঁকতেন। তাঁদের সঙ্গে থাকতে থাকতে অতুলপ্রসাদও হয়ে উঠেছিলেন সংগীতপ্রেমী। কখনো কখনো সুমিষ্ট কণ্ঠে গান গেয়ে তিনিও সকলকে মুগ্ধ করে দিতেন।

সংগীত চর্চার পাশাপাশি এই সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাঁকে কাব্যচর্চাতেও উৎসাহিত করে। এসব ক্ষেত্রে ঠাকুরদাদা রামপ্রসাদ এবং পনিমামা তাঁকে খুবই উৎসাহ দিতেন। কিন্তু তাঁর এই কাব্যচর্চার কথাটি প্রকাশ্যে এসেছিল ছোট বোন তপসির অন্নপ্রাশনে। অতুলপ্রসাদ তখন ১৪ বছরের কিশোর। তিনি ছোট বোনের জন্য লিখলেন,

তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠিল কুসুম ফুটিয়া
এ নব কলিকা হউক সুরভি তোমার সৌরভ লুটিয়া

এ কবিতার নিরাভরণ ভাষা ও সরল আন্তরিকতাময় আবেদন অতুলপ্রসাদের আগামী দিনের গীতবাণীর ইঙ্গিত দেয়—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৮৯০-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে অতুলপ্রসাদ কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন। পরে বিলাত থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ করে ১৮৯৫ তে দেশে ফিরে আসেন। কলকাতা ও রঙপুরে কিছুকাল ওকালতি করে লক্ষ্ণৌ শহরে সেখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রবাস জীবনেও অতুলপ্রসাদ তাঁর সংস্কৃতি চর্চা থেকে দূরে সরে থাকেন নি। ঘরোয়া বৈঠক করে সাহিত্যচর্চা করেছেন। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে গান বাজনাও করেছেন। বিলেতে দেশের মাটির টানে মন যখন উদাস, যখন অসীম শূন্যতায় ভরে যাচ্ছে বুক ঠিক তখনই বিদেশে মামাতো বোন হেমকুসুম তাঁর জীবনে এলেন শিশির বিন্দুর স্নিগ্ধতা নিয়ে। তাঁর সঙ্গে সংগীত নিয়ে আলোচনা করে, বেহালা শুনে সময়টা কেটে যাচ্ছিল ভালই।

কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বড়মামার সঙ্গে হেমকুসুমও দেশে ফিরে গেলেন, ফলে আবারও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পড়াশুনার জগতে ফিরে গেলেন অতুলপ্রসাদ।

১৮৯৫-এ ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ। দেশে ফেরার পর সরলা দেবীর মাধ্যমে পরিচয় হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। অতুলপ্রসাদের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই মুগ্ধতা স্নেহের বন্ধনে রূপ পেয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই। বন্ধন যে অত্যন্ত গভীর ছিল তা বুঝতে পারি তখন যখন দেখি রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৬-এ 'খামখেয়ালী' নামে একটি সাহিত্য সভা তৈরি করছেন এবং অতুলপ্রসাদকে সেই সভার কনিষ্ঠতম সদস্য হিসাবে বরণ করে নিচ্ছেন। শুধু 'খামখেয়ালী' সভাতেই নয় কবির সঙ্গে অতুলপ্রসাদ বেশ কিছু অন্তরঙ্গ দুপুর কাটিয়েছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। সেই আসরে থাকতেন কবিবন্ধু লোকেন পালিত, অতুলপ্রসাদ এবং কবি নিজে। অতুলপ্রসাদের তরুণ হৃদয় মন্ত্রমুগ্ধের মতো উপভোগ করত সেই সব মেধাবী সান্নিধ্য। অন্তরঙ্গতার সেই শুরু, ক্রমে সে অন্তরঙ্গতা গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি আর ভালোবাসায় পরিণতি পায়। তাই দেখি রবীন্দ্রনাথের ডাকে বারবারই সাড়া দিচ্ছেন অতুলপ্রসাদ। আবার অতুলপ্রসাদের আহবানকে রবীন্দ্রনাথও উপেক্ষা করতে পারছেন না। এই অন্তরঙ্গতার সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের ডাকে বঙ্গভঙ্গের দিনে লক্ষ্ণৌ থেকে ছুটে আসছেন অতুলপ্রসাদ কলকাতায়। ১৯২৩-এ কাশীতে উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে অতুলপ্রসাদের অনুরোধে সভাপতি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। এই অধিবেশনে অতুলপ্রসাদ গেয়েছিলেন সেই বিখ্যাত গান,

> মোদের গরব মোদের আশা
> আ-মরি বাংলাভাষা
> তোমার কোলে তোমার বোলে
> কতই শান্তি ভালোবাসা

১৯২৬-এ লখনৌ সংগীত সম্মেলনে সভাপতিও হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের উদ্যোগেই। একবার হিমালয় থেকে ফেরার পথে রবীন্দ্রনাথ সপার্ষদ রামগড়ে এসে কিছুদিন থাকলেন। তখন অতুলপ্রসাদের সঙ্গলাভের জন্য রবীন্দ্রনাথও উৎসুক। অতুলপ্রসাদকে তিনি লিখলেন,

> গ্রীষ্মের আতিশয্যে সকলেই মেঘের জন্য লালায়িত। আমি ভাবিতেছি অতুল কবে আসিয়া আমাদিগকে স্নিগ্ধ করিবেন।

কবি স্বয়ং আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। আনন্দে আত্মহারা অতুলপ্রসাদ ছুটে গেলেন কবির কাছে। সে দিনগুলোর কথা মনে রেখে রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে লিখলেন,

> অতুলপ্রসাদের গলা ছিল যেমন মিষ্টি, গাইবার ধরণও ভারি সুন্দর। সবচেয়ে ভালোলাগত তিনি যে আন্তরিকতার সঙ্গে ভাবে বিভোর হয়ে গান করতেন।

রথীন্দ্রনাথ এখানে যে 'আন্তরিকতার' কথা বললেন তা যে শুধু তাঁর গায়কীর প্রসঙ্গেই সত্য তা নয়, এ কথাগুলি তাঁর কবিজীবন সম্পর্কেই সত্য। তাঁর কবিতায়

রবীন্দ্রনাথের বর্ণচ্ছটা, ভাবের গভীরতা ও বৈচিত্র্য ততটা খুঁজে পাওয়া যায় না বটে তবে সেখানে যে প্রাণের আকুতি, ভালোবাসার গভীরতা, নিবেদনের আত্মমগ্নতা রয়েছে তা তাঁকে স্বতন্ত্র ও একক করে তুলেছে।

গীতিকার অতুলপ্রসাদের আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাগুলি এসে গেল এই কারণে অতুলপ্রসাদের গীতিকার সত্তার উন্মোচনে উল্লিখিত ঘটনাবলী, ব্যক্তি জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত উৎসাহী পাঠক-শ্রোতাকে নানাভাবে সাহায্য করে বলেই মনে হয়। সাহিত্য জগতে অতুলপ্রসাদের একমাত্র পরিচয় তিনি গীতিকার। তাঁর স্বতন্ত্র কোনো কাব্যগ্রন্থ নেই। তার গানের সংকলন 'গীতিগুচ্ছ' (১৩৩১) আড়াইশোরও কিছু কম গানের একটি সংকলন, এছাড়াও রয়েছে তাঁর গানের স্বরলিপি 'কাকলি'। দুটি গ্রন্থেরই প্রকাশক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। এত কম গান রচনা সত্ত্বেও অতুলপ্রসাদ একটি স্বতন্ত্র সংগীত ঘরানার জন্ম দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে।

'গীতিগুচ্ছ' সংকলনে অতুলপ্রসাদের গানগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। শ্রেণিগুলি হল স্বদেশ, দেবতা, প্রকৃতি, মানব এবং বিবিধ। রবিসঙ্গ কবিকে স্বদেশভাবনায় দীক্ষিত করেছিল। বঙ্গভঙ্গের দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানেই লক্ষ্ণৌ থেকে ছুটে এসেছিলেন অতুলপ্রসাদ কলকাতায়। নম্র স্বভাবের মানুষ হলেও স্বদেশী চেতনায় দীক্ষিত কবির দেশাত্মবোধক গানগুলি ছিল অসম্ভব দৃঢ় ও প্রত্যয়ী। প্রাদেশিকতার সীমা অতিক্রম করে কবি অতুলপ্রসাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ। বিলেতে থাকবার সময়ই বিদেশি সুরে শব্দ বসিয়ে রচনা করেছিলেন তাঁর প্রথম দেশাত্মবোধক সংগীত,

> উঠ গো ভারতলক্ষ্মী
> উঠ আদি জগতজন পূজ্যা
> দুঃখ দৈন্য সব নাশি
> করো দুরিত ভারত লজ্জা

ভারতলক্ষ্মীর আহ্বানের প্রাকমুহূর্তে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন সমস্ত দেশবাসীকে। অপমানিত মুহ্যমান দেশবাসীকে আত্মশক্তিতে জেগে উঠবার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন,

> বলো বলো বলো সবে শত বীণা বেণু রবে
> ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনের জন্য এ গানটি রচনা করেছিলেন অতুলপ্রসাদ। পরাধীন ভারতবর্ষের স্বদেশী সংগীতগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরাধীনতার জন্য আক্ষেপ এবং শৃঙ্খল মোচনের জন্য আবেদনে ভরা। অতুলপ্রসাদ তার এই জাতীয় সংগীতে আমাদের পরাধীনতার কারণ অতীতের সঙ্গে

বর্তমানের তুলনার মাধ্যমে ভারতবাসীর প্রকৃত অবস্থা নির্দেশ করে দেশবাসীকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র। অতুলপ্রসাদের ঈশ্বর অন্বেষা বিষয়ক গানগুলিতে রজনীকান্ত সেনের গানে উল্লিখিত পাপবোধ খুব একটা নজরে পড়ে না। পরিবর্তে এগুলিকে বলা যেতে পারে শরণাগতির গান। এখানে ঈশ্বরের প্রতি এক ধরনের বিষাদমধুর নির্ভরতা লক্ষ্য করা যায়। রজনীকান্তের দাস্যভাবের পরিবর্তে এখানে মধুর ও প্রতি বাৎসল্যের ভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়। তাই অনায়াস সারল্যে তিনি মা'কে বলতে পারেন,

তোর কাছে আসব মা গো
শিশুর মতো
মারবে মাগো, যতই মারো
ডাকব আমি ততই তোরে
ধরব যখন জড়িয়ে হাত
দেখব কেমন করবি আঘাত
তখন মা তুই, পাবি ব্যথা
ব্যথা দিতে অবিরত।

রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের সমগ্র জীবনসাধনাকে বলেছিলেন বেদনাভরা সাধনা। তাঁর ঈশ্বরানুভূতির গানগুলি পড়লে এই বিষাদমেদুর সাধনার আকুলতাময় উচ্চারণ আমাদের কানে বাজে। আমরা অনুভব করি ব্যর্থ জীবন সাধনার গ্লানি বুকে নিয়ে কবি ঈশ্বরের কাছে অনুযোগ করেছেন,

কেন তুমি মোরে করিলে কাঙাল?
বলো হে হরি, আর কতকাল
সুদিনের লাগি রহিব জাগি

কবি সুদিনের অপেক্ষায় রয়েছেন, দুঃখের অমানিশা তাঁকে বারবার বিচলিত করলেও তিনি অবিচল প্রতিজ্ঞায় উচ্চারণ করেছেন,

দুঃখেরে আমি ডরিব না আর
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার
জানি তুমি মোরে করিবে অমন
যতই অনলে দহিবে

কবি যেন রবীন্দ্রনাথের মতোই দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হতে চান। দুঃখের আগুনে নিজেকে সঁপে দিয়ে তিনি যেন রবীন্দ্রনাথের মতোই সেই দুঃখের দেবতার হাতে গড়ে ওঠা এক অব্যয় রূপ পেতে চান। তাই বলেন,

আমারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কর হে তোমার তরী
যাতে হয় মনোমত তেমনি করে লহ হে গড়ি।।

প্রায় একই কথা, একই কল্পনা, আকাঙ্ক্ষা, আকুলতা আমরা অনুভব করি এই গানটিতেও,

যে সুর তুমি গেয়েছিলে যে কথাটি কয়েছিলে
বারে বারে আমি তারে যাই যে ভুলে যাই।
এবার তুমি বিজন রাতে গানটি ধরো আমার সাথে
তোমার ওই তানপুরাতে সুরটি মোর মিলাই।

পরমের তানপুরা অবিরাম বেজে চলেছে। সেই অগমপারের বার্তা এসে পৌছালেও এ জীবনের নানা ছলনায় কবি বারে বারেই ভুলে যান তাঁকে, 'বিজন রাতে' নিভৃতে নির্জনে কবি তাই একান্ত সঙ্গোপনে সেই পরমের সুরে সুর মেলাবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছেন। এ ও তো এক বিষাদ চেতনার ফসল। বেদনার কবি অতুলপ্রসাদের অন্যান্য শ্রেণির গানগুলিতেও এই বেদনার ছোঁয়া অনুভব করা যায়। আকাশের বুকে রঙীন ওড়না গায়ে যখন মেঘবালিকারা ভেসে যায় তখন সেই ভাসমান মেঘপুঞ্জকে দেখে আকাশের উদ্দেশ্যে কবি বলেন,

আকাশ বল রে আমায় বল, আমার আঁখি জল
তাদের মতো জীবনখানি করবে কি শ্যামল

কবি কোন সত্যবোধ থেকে এই কথাগুলি উচ্চারণ করেছেন তা ভাবতে গেলে সেই বিষাদময় কবিচেতনাতেই আমাদের ফিরে যেতে হয়। বিষাদময়তায় ভরা এইসব গান শুনতে শুনতে সেদিন কবির পারিবারিক বন্ধু বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কবিকে বলেছিলেন,

আপনার গান শ্রোতার মনে কেমন একটা উদাস ভাব সৃষ্টি করে যেন মনে হয় জীবনটা নিরাশা আর বিষাদ মাখা। আনন্দ দেখা যায় কিন্তু সে আনন্দ অতৃপ্ত মনের বেদনায় ভরা।

একথা শুনে কবি উত্তর দিয়েছিলেন,

যেখানেই দেখছ আনন্দ— তলিয়ে দেখবে সেখান থেকেই পাবে দুঃখ ও ব্যথা।

তবে কি কবি মেনে নিতে চাইছিলেন তাঁর সমস্ত সৃষ্টিমূলে রয়েছে ব্যক্তি জীবনের নিঃসঙ্গতা ও দুঃখময় অভিজ্ঞতা? আমরা তো জানি স্ত্রী হেমকুসুমের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। অসাধারণ গুণী ব্যক্তিত্বময়ী ছিলেন হেমকুসুম। ভাল ইংরাজি বলতেন, বেহালা বাজাতেন অসাধারণ। হয়তো অত্যন্ত গুণী ব্যক্তিত্বময়ী ছিলেন বলেই অতুলপ্রসাদের আনুগত্যময় পারিবারিক জীবনকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। ক্ষমাশীল আর স্নেহশীল না হলে জীবনে শান্তি আসে না একথা তিনি

বুঝতে চান নি। তিনি কোনোদিনই অতুলপ্রসাদের 'সবারে বাসরে ভাল নইলে মনের কালো ঘুচবে না' এ ভাবনায় আস্থা রাখতে পারেন নি। অতুলপ্রসাদের মৃতা মা হেমন্তশশীর তৈলচিত্রখানি পর্যন্ত সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন অতুলপ্রসাদের ঘর থেকে। অত্যন্ত জেদি, মেজাজি এই মহিলা অতুলপ্রসাদের সুখের ঘরে চিরদিনের মতো তালা ঝুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই দুঃখ যন্ত্রণা অভিমান অপমান অতুলপ্রসাদকে ক্রমশই একা করে তুলেছিল। হয়তো এই কারণেই তাঁর প্রেম সংগীতগুলি বিষণ্ণতায় ভরা। তবে অতুলপ্রসাদ ব্যক্তিশোককে বিশ্বশোকের পর্যায়ে নিয়ে যেতে জানতেন। যে আমি 'স্তুতি নিন্দার জ্বরে' জর্জরিত সে আমিকে গোপন করেই কবি তাই গাইলেন,

আজি মোর শূন্য ডালা কি দিয়ে গাঁথব মালা
কেন এই নিঠুর খেলা খেলিলে আমার সনে
হয় তুমি থামাও বাঁশি নয় আমায় লও হে আসি
ঘরেতে পরবাসী থাকিতে আর পারিনে
কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে!

এ গানের আড়ালে ঈশ্বরপ্রেমী মানুষ যতই ঈশ্বর অন্বেষা খুঁজে পান আমাদের কানে কিন্তু গেঁথে যায় কয়েকটি শব্দবন্ধ— 'শূন্য ডালা', 'নিঠুর খেলা', 'ঘরেতে পরবাসী', 'ভাঙা কুঞ্জবনে', এই কথাগুলি কি আমাদের মনে করিয়ে দেয় না কবির প্রেমহীন আশ্রয়হীন জীবনকথাকে। অথচ কোনো কোনো শ্রাবণ সন্ধ্যায়, বর্ষা বাদল রাতে কবিরও তো মনে পড়ে যায় প্রবাসী হেমকুসুমের সঙ্গে কাটানো মধুর মুহূর্তগুলির কথা। 'ফেলে আসা সে সব রঙীন দিনগুলি' কবিকে ব্যাকুল করে তোলে কখনো কখনো। কবি সেই অচরিতার্থ প্রেমকেই আবার খুঁজে পেতে চান। তাই হয়তো সেই হেমকুসুমকে মনে রেখেই লিখলেন,

বঁধূ এমন বাদলে তুমি কোথা?
আজি পড়িছে মনে মম কত কথা!
গিয়াছে রবি শশী গগন ছাড়ি
বরষে বরষা বিরহ-বারি
আজিকে মন চায় জানাতে তোমায়
হৃদয়ে হৃদয়ে শত ব্যথা

বাদল ঘন দিনে যিনি কাতর, একা শয্যায় যে মানুষটি হেমকুসুমের কথা ভেবে বিনিদ্র সময় অতিবাহিত করেন, সেই হেমকুসুম একদিন কবির সমস্ত পোশাক পুড়িয়ে দিলেন। সেই ক্রোধ এবং বহ্নি থেকে পালিয়ে এসে কবি সেদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন দাদার বাড়ীতে, অথচ সেই রাতেই কবি লিখলেন,

যাব না, যাব না যাব না ঘরে
বাহির করেছে পাগল মোরে

এখানেই অতুলপ্রসাদ কবি, ব্যক্তিগত দুঃখকে অসম্ভব সংযমে নিয়ে গেলেন বিশ্বপ্রকৃতির দরবারে। এই বিশেষকে নির্বিশেষের স্তরভূমিতে পৌঁছে দেওয়াই হল সাহিত্য। এই সংযম, এই মহত্ত্ব হেমকুসুমের ছিল না বলেই গভীর বেদনায় অতুলপ্রসাদ লিখতে পারেন,

বধুয়া নিদ্ নাহি আঁখি পাতে
আমিও একাকী, তুমিও একাকী, আজি এ বাদল রাতে
ডাকিছে দাদুরী মিলন-তিয়াসে,
ঝিল্লী-ডাকিছে উল্লাসে
পল্লীর বধূ বিরহী বধুরে
মধুর মিলনে সম্ভাষে
আমারো যে সাধ বরষার রাত কাটাই নাথের সাথে
নিদ নাহি আঁখি পাতে

অথচ হেমকুসুমও যে খুব একটা সুখে ছিলেন তা নয়, অনেক বিনিদ্র রাত চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তিনি গেয়েছেন, 'নিদ নাহি আঁখি পাতে' একথা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ভাইপো অধ্যাপক অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন,

> একদিন দিদির সঙ্গে (হেমকুসুম) দেখা করতে গেছি কথায় কথায় রাত হয়ে গেল অবিশ্রাম বৃষ্টি হচ্ছিল-সেইখানেই রাত্রিযাপন করলাম শুয়ে শুয়ে শুনছি হেমকুসুমদি গাইছেন 'নিদ নাহি আঁখিপাতে'

এ এক আশ্চর্য সমাপতন দুটি মানুষ দুটি মানুষকে চেয়েছেন। একাকীত্বের যন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন। কিন্তু হেমকুসুমের দুর্জয় জেদ, অভিমান, অনাস্থা পথ রোধ করে দাঁড়াত। অথচ আজীবন কবিমন উষ্ণতাময় সান্নিধ্য খুঁজে গেছেন, বলেছেন,

এনেছি অধর ভরি শত শত চুম্বন
এনেছি হৃদয় ভরি শত শত কম্পন
রচেছি তোমার লাগি শত শত বন্ধন
আমি অন্ধ তোমার তৃষ্ণায়।

দৈনন্দিন জীবনভূমিতে এ অন্ধত্ব তাঁকে গ্রাস করেনি। তবে এ অন্ধত্ব ধীরে ধীরে নির্জনতার, নিঃসঙ্গতার বেলাভূমি পেরিয়ে কবিকে পৌঁছে দিয়েছে ঈশ্বরের চরণতলে। নয়নজলে ভাসতে ভাসতে কবি হঠাৎ যেন অনুভব করলেন বন্ধুর রথ এসে দাঁড়িয়েছে তার দুয়ার ধরে। দুর্বিসহ জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত কবিকে তিনি যেন দুহাত বাড়িয়ে তুলে নিতে চাইছেন। তাঁর হাত ধরে কবি চললেন সেই অগম

পারে। 'বুঝি মোর করুণ গানে ব্যথা তাঁর বাজল প্রাণে'। সেই আনন্দঘন অনুভবের কথা কবি আমাদের জানালেন এইভাবে,

একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়ন জলে
সহসা কে এলে গো এ তরী বাইবে বলে

সেই পরমবান্ধব আজ কবির জীবন তরীর হাল ধরেছেন। সুখ-দুঃখে, কষ্টে-যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত কবি আজ দুঃখের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন দুঃখ রাতের রাজাকে। যে রাজা এতদিন ছিল কল্পনায়, ভাবনায়, লোককথায় সে আজ মধুর রূপে এসে দাঁড়িয়েছেন কবির সামনে। সেই পরমাশ্চর্য অনুভূতির কথা কবি বলেছেন এইভাবে,

যা ছিল কল্পমায়া
সে কি আজ ধরল কায়া
কে আমার বিফল মালা
পরিয়ে দিল তোমার গলে?

জীবনের আপাত ব্যর্থতা, আপাত দুঃখের পথ বেয়েই কবি আজ বরণ করে নিয়েছেন তাঁর প্রাণের বান্ধবকে। কিন্তু তবু অতৃপ্তি থেকে যায়। তাঁকে 'ধরিলে যে তবু ধরা দেয় না' তাই আত্মনিবেদনের মালা সাজিয়ে প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়। সুখ-দুঃখের অনুভূতির ছবি একাকার হয়ে যায়। গভীর প্রত্যাশা বুকে নিয়ে কবি উচ্চারণ করেন,

হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে?
আমার মনের মাঝে ভবের কাজে মালিক হয়ে রবে - কবে?
আমার সকল সুখে, সকল দুঃখে,
তোমার চরণ ধরব বুকে;
কণ্ঠ-আমার সকল কথায়
তোমার কথাই কবে

পরিশ্রমে, হতাশায়, নৈরাশ্যে রক্তচাপ বাড়ছিল দ্রুত। কখনো গঙ্গাবক্ষে, কখনো সুন্দরবন, কখনো পুরীর সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেড়াতে জীবনের উপসর্গ গুলিকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করতেন। তবু একদিন এসে গেল শেষের সে দিন। ১৯৩৪-এর ২৬ আগস্ট। রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটে অগমপারে যাত্রা করলেন কবি। হয়ত অন্তিম এই মুহূর্তটির কথা ভেবেই একসময় কবি লিখেছিলেন,

যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায়
যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়।
সে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির রাতে।

সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দ একাকী সেই পরমের অভিসারে বেরিয়ে পড়লেন অতুলপ্রসাদ। কবির কোন জাত নেই, বর্ণ নেই, সংকীর্ণ ধর্মবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে না। তাই রাত্রির অবসানে সকালের আলো ফুটলে কবির মরদেহ কাধে তুলে নিলেন ডাঃ জগৎনারায়ণ এবং মিঃ মোহাম্মদ নাসিম। শ্রদ্ধানত সমস্ত দেশবাসীর কানে তখন বাজতে থাকে ঋষিপ্রতীম কবি অতুলপ্রসাদের গান,

সবারে বাস রে ভাল
নইলে (মনের) কালো ঘুচ্‌বে না রে।

গ্রন্থঋণ:

১. গীতিগুচ্ছ : অতুলপ্রসাদ সেন
২. অতুলপ্রসাদ : বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
৩. অনন্য অতুলপ্রসাদ : নূপুরছন্দা ঘোষ
৪. নিদ নাহি আঁখিপাতে : অরুণোদয় সাহা
৫. মানুষ অতুলপ্রসাদ : পাহাড়ী সান্যাল